Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXI, June 2014

জামাল উদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারার বিশ্লেষণ

মোঃ তৌহিদুল হাসান*

পাশ্চাত্য জগৎ যখন নৈতিক গুণাবলীর বিকাশের ও উৎকর্ষতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার চর্চাকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় ডাস্টবিনে ফেলে রেখেছিল; ধর্ম, ঈশ্বর ও পরকালীন জীবনের ধ্যান ধারণা ও চর্চাকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাষ্প যখন ক্রমান্বয়ে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি মানুষকে অধিকতর পার্থিব ও জাগতিক প্রাণীতে পরিণত করতে যখন বদ্ধপরিকর ছিল; জড়বাদী দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা যখন মানুষকে যান্ত্রিকতায় রূপান্তরের নেশায় মেতে উঠেছিল; মুসলিম বিশ্ব যখন শক্তি ও স্বকীয়তা হারিয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত ছিল; খন্ডিত জাতীয়তাবাদ যখন মুসলিম জাতিকে খন্ড-বিখন্ড করার উল্লাসে ফেটে পড়ছিল, ঠিক তখনই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অপরিহার্যতার বাণী নিয়ে, নৈতিক গুণাবলী বিকাশের ও উৎকর্ষতার অনিবার্যতার মশাল জ্বেলে, মুসলিম জাতির হারানো খিলাফাতের তথা বিশ্ব ইসলামী জাতীয়তার আওয়াজ তুলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতকে প্রকম্পিত করে যে প্রাণ পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, তিনিই হলেন মহামনীষী জামাল উদ্দীন আফগানী। অষ্টাদশ শতকের বিশ্ব ইসলামী রেনেসাঁর দুই দিকপাল জাজিরাতুল আরবের মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৮৭ ইং) এবং পাক-ভারত উপমহাদেশের শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র (১৭০৩-১৭৬২) সংস্কার আন্দোলনের পথ ধরে জামাল উদ্দীন আফগানীর যাত্রা শুরু।[১] তবে পূর্বসূরীদ্বয় হ'তে তাঁর পার্থক্য হলো সময়ের ব্যবধান। জামাল উদ্দীন আফগানীর (১৮৩৯-৯৭ ইং) সময় ছিল উনবিংশ শতাব্দীর পুরোভাগ জুড়ে। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা তথা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার প্রভাবে সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তখন ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর এহেন পরিবর্তনের প্রভাব তাঁর চিন্তা ও দর্শনে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষিত হ'তে থাকে। পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদ্বয় যা অনুধাবন করেছিলেন, জামাল উদ্দীন আফগানী সেটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার তাগিদ অনুভব করেন মাত্র। আর এজন্য তিনি মুসলিম জাহানের সর্বত্র এবং বাকী বিশ্বের

* ড. মোঃ তৌহিদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বহুস্থানে ব্যাপকভাবে সফর করে অভিজ্ঞতা সম্ভারে পরিপক্কতা অর্জনে সমর্থ হন। সমকালীন বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনসমূহের মূল কারণগুলো সহজেই তাঁর গোচরে আসে। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মুসলিম জাতির হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তিনটি বিষয়ের অপরিহার্যতা বাঞ্ছনীয়। এক. যথার্থ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার, দুই. নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষতা অর্জন এবং তিন. রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ।

বলা বাহুল্য যে, উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই তাঁর চিন্তা ও দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ সাধিত হয়। এ প্রবন্ধে জামাল উদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারার উক্ত তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যবহ আলোচনা ও বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত করা হলো। কেননা, জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারার উক্ত তিনটি দিকের ভিত্তিতেই মুসলিম বিশ্বের পরবর্তী ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের যে মজবুত কাঠামো গড়ে উঠেছে, তার ব্যবহারিক দিকেরই বিকাশ ঘটে উপমহাদেশের অপর দুই প্রখ্যাত চিন্তাবিদ-এর নেতৃত্বে। এ দু'জন হলেন আল্লামা ইকবাল ও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। জামাল উদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারার ব্যবহারিক দিক নিয়ে বাস্তবভিত্তিক আন্দোলন করে মুসলিম জাতির জন্য বিশেষতঃ উপমহাদেশীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে সফল হন মহাকবি আল্লামা ইকবাল। অন্যদিকে, তাঁর চিন্তাধারাকে স্থায়ী ও আধ্যাত্মিক রূপদানে প্রয়াসী হন সাইয়েদ আবুল আ'লা যা লেখনী, দাওয়াত ও সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যবহারিক চর্চায় সমাজ ও রাষ্ট্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়। কার্ল মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক জড়বাদী চিন্তাধারার বাস্তব ও প্রায়োগিক ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দর্শনকে অধিবিদ্যার নিগড় ও শৃংখল থেকে বিমুক্ত করে যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন; তেমনিভাবে সাইয়েদ আবুল আ'লা ইসলামকে খানকাহ্, মাদ্রাসা ও মসজিদের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বের করে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও সংস্কারের কাজে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রয়োগ করেন। আর এক্ষেত্রে তিনি প্রেরণা লাভ করেন জামাল উদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারার উক্ত তিনটি অপরিহার্য দিক থেকে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, তাঁর প্রভাব মিশরীয় চিন্তাবিদ মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু, হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব ভ্রাতৃদ্বয়সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের চিন্তাবিদকেই উদ্বুদ্ধ করেছে।

১. ধর্মীয় চিন্তাধারা : জামাল উদ্দীন আফগানী উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে আবির্ভূত হন, তৎকালে মুসলিম বিশ্ব তথা তুরস্ক, মিশর, মধ্য-এশিয়া, পারস্য,

পাক-ভারত উপমহাদেশ প্রভৃতি স্থানের সনাতনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একদিকে যেমন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা যথা – কুরআন, হাদীস, ফিকহ্, তাসাউফ, মানতিক, ফালসাফা, আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতির পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল; তেমনিভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিরও ব্যাপক প্রভাব ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। তিনি জন্মগতভাবে ইরানের আসাদাবাদ মতান্তরে আফগানিস্তানের আসাদাবাদ তথা মুসলিম জাহানের উপর্যুক্ত অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মাত্র ১৮ বছর বয়সে দ্বীনি শিক্ষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন।[২] উদার হৃদয়ের অধিকারী ও সংকীর্ণতামুক্ত হওয়ায় তিনি ইংরেজী শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব সহকারে আয়ত্ব করতে প্রয়াসী হন এবং সেক্ষেত্রে পারদর্শীতা লাভে সক্ষম হন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রগতিশীল। তাঁর ধর্মীয় ব্যাখ্যায় যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তা ছিল দ্বান্দিক। প্রথমতঃ তিনি ধর্ম বিরোধী, জড়বাদী ও ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের মতামত খন্ডন করেন; অতঃপর ধর্মের অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হন।[৩] রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্ট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় রেনেসাঁর দৌরাত্মে আধ্যাত্মিকতা তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যখন পরাজয় ঘটে; তখন প্রটেস্ট্যান্ট ও রিফর্মিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে খ্রিস্ট ধর্ম গির্জায় প্রবেশ করে। একদা যে যাজকতন্ত্র ও পোপতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নিয়ন্ত্রণকারী ও শোষণকারী শক্তি তথা মহা শক্তিধর চার্চ হিসেবে বিবেচিত হতো, তা সবকিছু পরিত্যাগ করে গীর্জামুখী হতে থাকে। প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতিতে জড়বাদী দর্শনের বিকাশ তরান্বিত হয়। অতি অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম সমাজের সর্বত্রই ইউরোপীয় নাস্তিক্যবাদী দর্শনের পঠন-পাঠন ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ইংরেজী শিক্ষার আদলে ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ, হার্বাট স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্কস-এর দ্বান্দিক জড়বাদ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদ, এমিল ডুরখেইমের সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ, জন লক, রুশো ও হবস্-এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রাচ্যের তথা মুসলিম জাহানের সর্বত্রই ব্যাপকবাবে প্রসার লাভ করতে থাকে। জামাল উদ্দীন আফগানী স্বীয় ধর্মীয় চিন্তাধারার উক্ত নেতিবাচক দিকের মধ্য দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের স্বরূপ তুলে ধরেন এবং মুসলমানদের জন্য এটিকে অতীব ধ্বংসকারী ও ক্ষতিকর এক উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

আফগানী তাঁর *রদ্দে আলাদ্‌দাহিরিয়্যা (জড়বাদীদের খণ্ডন)* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন যার মূল নির্যাস এখানে তুলে ধরা হলো।[৪] Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অসংখ্য অর্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমত. Secularism অর্থ হলো Scepticism বা সংশয়বাদ।[৫] সংশয়বাদ সেই মতবাদকে বলা হয় যা জ্ঞান, সত্য ও সত্ত্বা–এই তিনটি বিষয়েরই কোনো স্থায়ী, নিশ্চিত ও সার্বজনীন রূপ বা অস্তিত্ব স্বীকার করেনা। সংশয়বাদীরা সর্বদাই নিজস্ব মতবাদ ও বিশ্বাসকে যেমন সন্দেহ করে, তেমনিভাবে অন্যের মতামত, আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতিও কোনো আস্থা তারা পোষণ করতে পারেনা।[৬] অন্যদিকে, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা যা অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণে দেখা যায়না, তার অস্তিত্বকেও তারা স্বীকার করেনা। ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকিদা সম্পর্কে তাদের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকেনা। আর ধর্মীয় বিশ্বাস যেহেতু নেই সেহেতু, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতিরও কোনো গুরুত্ব উক্ত সংশয়বাদীদের নিকট থাকেনা। সাধারণ আটপৌরে সামাজিক ও রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী তাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলসহ জীবনের চলার পথের সর্বত্রই যেমন ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে চলে বা ধর্মীয় বিধান পালন করে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে, সংশয়বাদ অর্থের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সে ধরনের কোনো জীবন যাপনে অভ্যস্ত নয়।[৭] ফলস্বরূপ, এ জাতীয় মানুষ কিছুটা সমাজ ও রাষ্ট্রবিমুখ হয়ে থাকে। Secularism-এর অন্য একটি অর্থ হলো নাস্তিক্যবাদ ev Atheism।[৮] এ অর্থে ব্যক্তি কোন ধর্ম, ঈশ্বর বা আধ্যাত্মসত্তা ও পরকালকে স্বীকার করেনা। এ ক্ষেত্রে Secularism জড়বাদ, বস্তুবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মতবাদের সমার্থক যা যাবতীয় অজড় ও অশরীরী সত্ত্বাকে অবিশ্বাস করে। Secularism-এর অন্য একটি অর্থ হলো চরম অভিজ্ঞতাবাদ (Extreme Empericism) ও যৌক্তিক দৃষ্টবাদ (Logical Positivism)। এ মতবাদগুলোর মধ্যে David Hume-এর অভিজ্ঞতাবাদটি বেশী চরমবাদ। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের বাইরে কোনো বস্তু বা সত্ত্বাকে এ মতবাদ স্বীকার করেনা। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরাও প্রত্যক্ষণের অতীত কোনো কিছুর অস্তিত্বকে অর্থহীন মনে করে। অধিবিদ্যার জগত এবং সে জগতের সত্ত্বা ও অস্তিত্বকে এরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করেনা। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় যা পরখ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। Secularism-এর অন্য একটি অর্থ হলো Agnosticism বা অজ্ঞেয়বাদ।[৯] এ মতে Secularism অর্থ হলো ঈশ্বর বা সত্ত্বা আছে কি নেই তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, তাদের মতে মানুষের সাধারণ চলার পথে

এগুলি ছাড়াও চলা যায়। তাছাড়া, কার্ল মার্কস-এর সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদ তথা দ্বান্দ্বিক জড়বাদী মতবাদে ধর্মকে আফিম বলে গণ্য করা হয়।[১০] এছাড়াও পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যান্য অধিকাংশ মতবাদই ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক বলে মত প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য যে, জামালউদ্দীন আফগানী ধর্ম সম্পর্কিত এধরনের সব বিরোধী মতবাদসমূহের সমালোচনা করেছেন।

জামালউদ্দীন আফগানী ধর্মের ব্যাপারে প্রচলিত বিরুদ্ধ মতবাদসমূহের সমালোচনার সাথে সাথে একই ধর্মের মধ্যে যে সব মাজহাব ও পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহ বিদ্যমান আচে– সেসবেরও সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে যতটুকু না আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার করেছেন তার চেয়ে বেশী কাজ করেছেন বাস্তব ও প্রয়োগিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। ইসলাম মূলতঃ একটি ব্যবহারিক ধর্ম তথা জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের তাত্বিক যেসব বক্তব্য আছে তা আপাতঃদৃষ্টিতে তত্ত্ব সমৃদ্ধ মনে হলেও, আসলে তা সবই ব্যবহারিক। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ছিলেন কুরআনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। কুরআনকে ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখানোর জন্যই তাঁকে নবীরূপে পাঠানো হয়েছে। জামালউদ্দীন আফগানী মুসলিম জাতির উক্ত ক্রান্তিকালে এই সত্যটিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম কথা বা বাণী সম্বলিত ধর্ম নয়, বরং তা কাজ বা বাস্তব উপযোগিতামূলক ধর্ম।

যাইহোক, ধর্মের বিরূদ্ধবাদীদের সমালোচনার পর ধর্মের ইতিবাচক দিক নিয়ে তিনি কথা বলেন। তাঁর চিন্তাধারায় বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১ ইং) ধর্মের যৌক্তিকতা তত্ত্বের গন্ধ পাওয়া যায়।[১১] কারণ, সময়ের দিক থেকে হেগেল আফগানীর অল্পকাল পূর্বে আসেন। তাঁর ধর্ম ও ইতিহাস সচেতনতার দৃষ্টান্ত আফগানীর মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। আফগানী মনে করতেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এ ব্যাপারে তিনি রসূলুল্লাহ্র (সঃ) হাদীসের উল্লেখ করেন যে, "ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ বা আবশ্যকীয় বিষয়।" একজন মুসলিমের তিনটি অপরিহার্য গুণাবলীর মধ্যে প্রথমটি হলো তাঁর নিজ ধর্মের ধর্মীয় জ্ঞান পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষভাবে অর্জন করা ও ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া। জামালউদ্দীন আফগানী যে সময়ের মানুষ, সে সময় প্রত্যেক মুসলিমকেই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে হ'ত; কিন্তু পরবর্তীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বিকাশের সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুসলিম সন্তান কুরআন, হাদীস, ফিকহ্, আরবী ব্যাকরণ এবং

ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য না শিখে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্যুলার শিক্ষা অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করে জাগতিক ধর্মবিমুখ শিক্ষা লাভ করে একজন মুসলিম উপর্যুক্ত অপরিহার্য তিনটি গুণাবলীর একটিকে অমান্য করে স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করার দোষে দুষ্ট হলো।

ধর্মকে আফগানী মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও স্থায়ী কল্যাণের অপরিহার্য বাহন হিসেবে গণ্য করেন।[১২] তাঁর মতে, যথার্থ ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণই মানব জীবনের প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের উৎস। ধর্ম মানুষকে কতিপয় নীতি, মৌলিক কিছু মূল্যবোধ এবং মানুষের জীবন ও জগতের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম উৎকর্ষতা শিক্ষা দেয়। আর যিনি খাঁটি বিশ্বাসী ও ধর্মভীরু তিনি অবশ্যই মানবজাতি ও অন্যান্য সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর উপাদান হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মতে, ধর্মীয় জ্ঞান একজন মানুষকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় করে দেয়। আর এহেন পরিচয় জ্ঞানকেই প্রকৃত মারেফাত বলা হয়। মানুষের সাথে যদি তাঁর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় না হয়, তবে সেই মানুষ স্বীয় প্রভূর আবদিয়্যাত বা দাসত্বের অনুভূতি দ্বারা রঞ্জিত হতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র দাসত্ব বা গোলামীর অনুভুতিসম্পন্ন লোককেই বলা হয় মুসলিম বা সম্পূর্ণ অনুগত। যদি কোনো মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ভয়, আশা, দয়া ও ক্ষমা প্রভৃতি অনুভূতিসম্পন্ন না হয় তবে সে হবে বেপরোয়া, স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য। তার ভিতরে যে সব পশু প্রবৃত্তি আছে–তা লাগামহীনভাবে জাগরিত হবে। অতঃপর উক্ত মানুষ মনুষ্যত্বের কোনো সীমানা দ্বারা সীমায়িত থাকবে না, বরং সে সভ্যতা ও শালীনতার যাবতীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করবে এবং অংহকারী, ধ্বংসকারী ও মানুষের অধিকার বিনষ্টকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তাই মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে হলে ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী তা পালন করতে হবে।

জামালউদ্দীন আফগানীর দৃষ্টিতে ধর্মীয় জ্ঞান হবে প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী। তিনি স্বীয় শিক্ষা, আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম সর্বদায় একটি গতিশীল বিষয়। প্রগতি ও চলমান আবিষ্কার, উদ্ভাবনী, উন্নতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে ইসলাম ধর্ম কখনোই উপেক্ষা করে না। যদি কেহ ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়া ও জাগতিক উন্নতি বিরোধী কোনো মনোভাব ও ধ্যান-ধারণা পোষণ ও লালন করে থাকে, তবে তা অবশ্যই বর্জনীয় ও উপেক্ষণীয়।[১৩] বরং ধর্মীয় মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসকে ঠিক রেখে যুগের ভাল ও উত্তম সব কিছুকে গ্রহণ করাতেই নিহিত আছে যথার্থ ধর্মীয় জীবনের প্রকৃত সফলতা। এভাবে

জামালউদ্দীন আফগানী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা মুসলিমের প্রথম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করেন।

২. নৈতিক চিন্তাধারা : ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পর একজন মুসলিমকে দ্বিতীয় যে অপরিহার্য কাজটি করতে হবে, তা হলো তার মৌলিক মানবীয় গুণাবলী, নৈতিক গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা। আর এজন্য প্রয়োজন সুকঠিন আত্মিক সাধনা এবং রিয়াজতের যা একজন মানুষকে প্রকৃত ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করে। আফগানীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এমন এক অনুকরণীয় ও আদর্শস্থানীয় ছিল যে, তার তুলনা চলে একমাত্র নবীর (সঃ) প্রকৃত অনুসারীর সাথেই। তাঁর মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদার অনেক বৈশিষ্ট্যই জ্বাজ্জ্বল্যমান ছিল। হযরত আবু বকরের (রাঃ) ন্যায় তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার প্রকৃতির; ওমর ফারুকের (রাঃ) ন্যায় ছিলেন অমিততেজী, সাহসী, তেজস্বী, অকুতভয়, বাগ্মী, দূরদর্শী ও বিশাল হৃদয়ের; হযরত উসমানের (রাঃ) ন্যায় ছিলেন নিরাভিমান, কর্মপ্রিয়, অন্তর্মুখি ও নম্র প্রকৃতির; অন্যদিকে, হযরত আলীয় ন্যায় বিচক্ষণ, বীর, জ্ঞানী, ক্ষুরধার, ভাবুক, আবেদ ও প্রতুৎপন্নমতি। জামাল উদ্দীন আফগানী সম্পর্কে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম *জামাল উদ্দীন* শীর্ষক একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উদ্ধৃত করা হলো:

সালাম, সালাম, জামাল উদ্দীন আফগানী তসলিম,
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য, পুরুষ-মহামহিম॥
সাম্য ওমর ফারুকের তুমি, আলীর জুলফিকার,
অসম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার,
নিরাকার কারবালা প্রান্তরে দুলদুল আসওয়ার,
জড় ও ক্লীবের মাঝে এসেছিলে আদর্শ মুসলিম॥

কারাগারে তুমি দেখিলে স্বপন কোন্ মহামুক্তির,
ভাঙ্গিয়া বুলন্দ-দরওয়াজা হলে মুক্তলোকে বাহির,
খান খান হয়ে টুটিল অমনি চরণের জিঞ্জির
রাঙ্গিল আকাশ, বন্দির বুকে জাগিল আশা অসীম॥
শত লাঞ্ছনা জুলুম সহিয়া ভাঙ্গিল সবার নিদ,
বুকের রক্তে সুবহে সাদেক আনিয়া হলে শহীদ,
জাগিল কাবুল, মেসের, ইরান, তুর্ক, আরব, হিন্দ,
তুষার-সাগরে হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ান ভীম॥

সউদ, কামাল, জগলুল-পাশা, ইবনে-করিম বীর,

তোমার মানস-পুত্রের রূপে এল উন্নত শির,
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর,
প্রাচীর গর্ব, সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম।[১৪]

(*বুলবুল*, চৈত্র, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)

জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিরচিত উপর্যুক্ত কবিতাটিতে জামাল উদ্দীন আফগানী সম্পর্কে যে, স্তুতিবাক্য স্ফূরিত হয়েছে, তাতে স্বভাবতঃই তাঁকে একজন মর্দ্দে মুমিন, ইনসানে কামেল, আরেফ বিল্লাহ, সর্বোপরি, শতাব্দী শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদে মিল্লাত বলে স্বীকৃতি দেয়া অমূলক কিছু নয়। তাঁর চিন্তা, দর্শন ও আদর্শের নৈতিক দিক ছিল অত্যন্ত ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক। আমরা জানি ইসলাম একটি ব্যবহারিক জীবন ব্যবস্থা। তত্ত্ব, দর্শন ও আদর্শ যা আছে, তার সবই মানব জীবনের সর্বদিকের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক উপযোগিতার জন্য প্রযোজ্য। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা কেন সেকথা বল, যা তোমরা কর্মে পরিণত করতে পারনা?"[১৫] অর্থাৎ ভাষণ বা বক্তৃতায় যা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, তা অবশ্যই নিজের জীবনে পালন করে দেখাতে হয়–এটিই ইসলামী জীবনদর্শনের মূল কথা জামাল উদ্দীন আফগানীর জীবনে এ ধরনের যথার্থ ইসলামেরই প্রকৃষ্ট বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়। তিনি কথার চেয়ে কাজে অধিক পরিমাণে বিশ্বাসী ছিলেন। রসূলের (সঃ) সেই মহান উক্তি "উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণতাদানের জন্যই আমি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"–এরই সার্থক বাস্তবায়ন দেখতে পাই জামাল উদ্দীনের জীবন চরিত্রের মধ্যে।

জামাল উদ্দীন আফগানীর জীবন চরিত বিশ্লেষণ করলে ইসলামী নৈতিকতার যে চিরন্তন রূপ ও প্রকৃতি আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো– (এক) সাধারণ নৈতিক গুণাবলী ব্যক্তিগত পর্যায়ের যেমন– (ক) ইসলাম ও সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, (খ) স্ব-জাতির ও অন্যান্য জাতিসমূহের উত্থাপন-পতনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান। (গ) আল্লাহ্, রসূল ও আখিরাত এবং এ তিনটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়ের প্রতি গভীর ঈমান ও আস্থা। (ঘ) চরিত্র ও আচরণকে পরিশুদ্ধ করণ। চরিত্র ও আচরণের ক্ষেত্রে আফগানীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিচিত্র ও বহুমুখিন। তাঁর মধ্যে সমাবেশ ঘটে আল-গাযালীর (১০৫৮-১১১১ ইং) সূফীবাদী দর্শন ও সাধনার কঠিন রূপের। অন্যদিকে ইবনে খলদূনের (১৩৩২-১৪০৬ইং) সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিশ্লেষণী ও পরিচালনাকারী ব্যক্তিত্বের। আফগানীর দৃষ্টিতে মুসলিম হতে হলে ব্যক্তি চরিত্রের যাবতীয় সৎ গুণাবলী অর্জনে এবং সেগুলির বিকাশের

সাধনায় আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি জীবনকে দেখেছেন আখিরাতের মহাজীবনের এক প্রস্তুতিকাল হিসেবে। সাথে সাথে পার্থিব জীবনেও এমন কিছু ছাপ রেখে যেতে হবে যা পরবর্তী জেনারেশনের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্যক্তিগত যেসব গুণাবলী একজন মানুষকে যথার্থ মুসলিম বা মু'মিন হিসেবে গড়ে তোলে তার মধ্যে কতিপয় বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা, বিশ্বাস ও কর্মের পরিপূরক হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান থাকা। আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ও আস্থা রাখা একজন মুসলিমের প্রধান ও প্রথম কাজ। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র সাথে জগৎ ও মানুষের সম্পর্ক, আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা; সেসব গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো; জগতে মানুষকে প্রেরণের পেছনে মহান আল্লাহর যে মিশন তা জানা এবং সে মিশনের সাথে নিজকে সমর্পিত করা প্রকৃত মুমিন বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। জামাল উদ্দীন আফগানী অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে ঈমানী দৃঢ়তার উপর মজবুত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেন।[১৬] এজন্য শরিয়তের পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ প্রয়োজন। শরিয়ত অনুসরণের প্রাথমিক ধাপ হলো দীন-ইসলাম, কুরআন-হাদীস, রিসালাত, আখিরাত, তাকদীর, ইহকালের অস্থায়িত্ব, আখিরাতের স্থায়িত্ব সহ যাবতীয় বিষয়ে আকিদা দুরস্ত করা এবং রসূলের (সঃ) আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে পালন করা। বলা বাহুল্য যে, এসবে উত্তরোত্তর দৃঢ়তা প্রদর্শন করাই হলো ইসলামী নৈতিকতার প্রধান স্তম্ভ।

জামাল উদ্দীন আফগানী দেখিয়েছেন যে, এ যাবৎ কালের প্রায় অধিকাংশ মুসলিম স্কলারের, মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলামী জীবন দর্শনের তিনটি অপরিহার্য দিকের (ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনৈতিক) পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। অনেকে সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলেও তা বাস্তবায়নের কোনো নির্দেশনা দিতে সক্ষম হননি। অনেকে আবার ধর্মীয় জ্ঞানের গুরুত্ব অধিক মাত্রায় দেখালেও নৈতিক শুদ্ধিকে তত বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেননি। কেউ কেউ আবার ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞাকে গুরুত্ব দিলেও রাজনৈতিক সংগঠন ও ক্ষমতার্জনকে ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার অনেক চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিক গুণাবলীকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভকে সফলতা লাভের মাপকাঠি মনে করায় রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে ও তার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ফলে রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষতার সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছে;

সমকালীন এবং বর্তমান বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রনায়কই শেষোক্ত মতবাদে বিশ্বাসী। ফলে মুসলিম জাহান পাশ্চাত্যের ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দর্শনের ধুম্রজালে ঘুরপাক খাচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, জামাল উদ্দীন আফগানী মুসলিম জাতির এ রোগটি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ধরতে পেরেছেন।

নৈতিক গুণাবলীর অপরিহার্যতার কথা তিনি কেন বলেছেন, এ বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে আমরা দেখতে চাই কোন্ কোন্ নৈতিক গুণাবলীকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন–একজন মুসলিম সারাদিন রোযা থাকেন এবং উক্ত সময়ে তিনি শুধু আল্লাহ্র জিকির করেন, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে ফিকির বা তাফাকুর করেন, সময় পেলেই কুরআন তেলওয়াত করেন, সারা রাত্র কিয়াম, রুকু-সেজদা ও ঈবাদাতে মশগুল থাকেন। আর এ ধরনের নিয়ামত প্রাপ্তিতে তিনি মহান রব্বুল আলামিনের শোকর আদায়ে ব্যস্ত থাকেন। যুহদ, কানায়াত, রিয়াজাত এ সব ধরনের নৈতিক গুণাবলী তার মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও জামাল উদ্দীন আফগানীর মতে শুধুমাত্র এই প্রকৃতির নৈতিকতার উৎকর্ষতায় মুসলিম জাহান তার হারানো গৌরব ফিরে পাবেনা। তাঁর মতে, ইসলামের ধর্মীয় জীবন, নৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবন পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনো সত্ত্বা নয়। বরং একই মুমিন জিন্দেগীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের অন্তহীন এক প্রক্রিয়াকেই নৈতিক গুণাবলী বিকাশের ও উৎকর্ষতার সাধনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জামাল উদ্দীন আফগানীর নির্দেশিত ও প্রদর্শিত নৈতিকতার উপাদান বা নৈতিক কাজ সমূহের বিভিন্ন দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

১) আকিদা-বিশ্বাসকে দৃঢ় করা: জামাল উদ্দীন আফগানীর মতে, একজন মুসলিম তার নৈতিক গুণাবলী বিকাশের শুরুতেই তার ঈমান-আকিদা ও বিশ্বাসকে সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে এবং সে বিশ্বাস ও আকিদাকে সদা সমুন্নত রাখার চেষ্টা করবে। কোনো প্রতিকূল অবস্থাতেই, কিংবা কোন ঝড়-ঝাপটাতেই তা বিনষ্ট হবে না। বরং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও টিকে থাকার জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে, তার মধ্যেই মানুষের প্রাণ ও অস্তিত্ব নিহিত থাকে বলে তিনি মনে করেন। টিকে থাকার এ ধরনের নিরন্তর প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলা হয়।[১৭] এহেন জিহাদ যেটি নিজের প্রবৃত্তির সাথে বা বিরুদ্ধে করতে হয় তারই নাম জিহাদুল আকবর বা বড় জিহাদ।

২) তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন: ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি হলো পবিত্রতা অর্জন করা।

আর এ পবিত্রতা শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও আত্মিক বা আধ্যাত্মিক–এই চার ধরনের। স্বীয় শরীরকে নাজাসাত থেকে পবিত্র করতে ওজু বা গোসলের

প্রয়োজনীয়তা যেমন আছে। অন্যদিকে, মন ও মননকে যাবতীয় শিরক, বিদআত ও কুফরী থেকে পরিষ্কার করে তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও রসূলের সুন্নাহ দ্বারা আলেকিত করাকে মানসিক পবিত্রতা বলা হয়। আয়, ব্যয়, ও লেন- দেনের ক্ষেত্রে হালাল উপার্জন করাকে আর্থিক পবিত্রতা বলা হয়। অন্যদিকে, হিংসা, অহংকার, রিয়া, খোদপসন্দি, কৃপণতা, প্রতারণা, মিথ্যা, গীবত প্রভৃতি দোষ-ত্রুটি থেকে আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করাকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতা বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই চারটি ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা অর্জন করা ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম দাবী। জামালউদ্দীন আফগানী নৈতিকভাবে প্রতিটি মুসলিমকে যে উন্নত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন–তার মধ্যে এহনে পরিশুদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত।

৩) **ফরয ইবাদাত পালন করা:** প্রতিটি মুসলিম তার উপর আল্লাহ্‌ কর্তৃক যেসব ফরয ঈবাদাত নির্ধারণ করা আছে, তা অবশ্যই পালন করবে। কারণ এসব ঈবাদাত আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। যেমন–নামায মুমিনের মে'রাজ। রোযা ঢাল স্বরূপ। যাকাত ইসলামের স্তম্ভ এবং হজ্ব হলো গুনাহ মাফের পরিষ্কার পানি স্বরূপ। আর এসব ঈবাদাত নিয়মিত পালন না করলে ইসলামী জিন্দেগীর যাবতীয় নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গ হয় এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা শিথিলতায় পর্যবসিত হয়। এছাড়া জিকির করা, কুরআন তেলওয়াত করা, দোয়া ও অজিফা আদায় করা– এসবই মু'মিন জীবনের নৈতিক বাধ্যবাধকতার অংশ।[১৮] আর এসব ফরয বা আবশ্যকীয় এবং নফল বা অতিরিক্ত কাজ বা আচরণসমূহ প্রতিনিয়ত সুচারুরূপে সম্পাদন করলে এক ধরনের গুণাবলীর উৎকর্ষতা সাধিত হয় যা একজন মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল হিসেবে দাঁড় করাতে সাহায্য করে।

৪) **কতিপয় দোষ-ত্রুটি বর্জন:** (ক) কামরিপু দমন তজ্জন্য ব্রহ্মচর্যা বা সিয়াম পালন (খ) অতিভোজন স্পৃহা দমন, (গ) কু-প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা অবদমন, (ঘ) অধিক কথন বর্জন, (ঙ) ক্রোধ-ঈর্ষা, কপটতা ও হিংসা প্রভৃতি পরিত্যাগ; (চ) সংসারাসক্তি নিয়ন্ত্রণ ও তথা স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা মাতা-পিতা, ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে হৃদয়ের সহজাত আকর্ষণ থাকে–সেটিকে অধিক হতে না দেয়া; (ছ) ধন-সম্পদ ও বিলাস দ্রব্যের প্রতি মোহ দমন, (জ) ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদার মোহ অবদমন, (ঝ) রিয়া, গর্ব, অহংকার দূরীকরণ, (ঞ) আত্মপ্রবঞ্চনা, খোদপসন্দি, আত্মম্ভরিতা ও অসাবধানতা দুরীকরণ। এখানে এমন কতিপয় দোষ-ত্রুটির নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেগুলোকে মানবাত্মার স্থায়ী ও প্রকৃতিগত ত্রুটি বা দোষ বলা হয়। আল-গাযালী এসব দোষ-

ত্রুটিকে শ্রেণীকরণ করে একটি একাডেমিক শৃংখলার মধ্যে আনয়ন করেছেন যা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে।[১৯] কিন্তু, এগুলো থেকে মানবাত্মাকে সুকঠিন আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ না করলে সে আত্মা হয় নিকৃষ্টতম। সে ধরনের আত্মা দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র জিকির বা স্মরণ, ফিকির, মোরাকাবা, মোশাহাদা কোনটিই সম্ভব নয়। আর যারা আত্মার এসব দোষ-দূরীভূত করতে সক্ষম হয়না, তারা মুমিনে কামেল হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। আর এ ধরনের যোগ্যতা যাদের নেই তারা নায়েবে নবী বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া কিংবা মুজাদ্দিদে মিল্লাত হতে পারেনা। জামাল উদ্দীন আফগানীর ইসলামী খিলাফাতের দাওয়াত ও বহ্নিশিখা বিশ্ব মুসলিমের তৎকালীন মরুসাগরে এমন এক সাইমুম ঝড়ের সৃষ্টি করেছিল যে, প্রায় প্রতিটি মুসলিমই সে ঝড়ের প্রবাহে কম-বেশি প্রকম্পিত হয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ইসলামী নীতিবিদ্যার যে রূপরেখা আল-গাযালী উপস্থাপন করেছিলেন, তার প্রভাবের আলোকচ্ছটা পরবর্তী সব মুজাদ্দিদ ও আরেফে বিল্লাহ্‌কেই স্নাত করেছিল। তাই, জামাল উদ্দীন আফগানীর মধ্যেও সেই নৈতিকতার দ্যুতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

সদগুণাবলী অর্জন: উপর্যুক্ত অসৎ প্রবণতারাজী মানবাত্মা থেকে দূরীভূত করার পর সেখানে বেশ কিছু সদগুণাবলী সন্নিবেশিত করা ইসলামী নৈতিকতা ও অধ্যাত্মিকতার এক বড় পদক্ষেপ। শুধু দোষ-ত্রুটি দূরীভূতকরণ নয় বরং বেশ কিছু সদগুণ অর্জনের ফলে একজন মর্দে মুমিন ফেরেশতাসম পবিত্র চরিত্র ও গুণাবলীতে ভূষিত হতে পারেন। সেসব গুণ হলো (ক) তওবা ও ইস্তেগফার, (খ) শোকর ও তা'রিফ, (গ) সবর বা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, (ঘ) জাহান্নামের শাস্তির ভয় এবং আল্লাহ্‌র রহমতের আশা, (ঙ) কানায়াত বা স্বল্পেতুষ্টি, (চ) সম্পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতার প্রতি অনীহা, (ছ) এখলাস বা সদিচ্ছা বা নিয়্যাত, (জ) সত্যকথন বা সিদ্‌ক, (ঝ) সততা, (ঞ) আমানতদারী, (ট) ওয়াদা পালন, (ঠ) মোরাকাবা ও মোশাহাদা, (ড) মোহাসাবা, (ঢ) তাফাকুর বা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা, (ণ) তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল, (ত) আল্লাহ্‌র প্রেম, (থ) সৃষ্টির প্রতি প্রেম এবং (দ) মৃত্যুচিন্তা। এসব গুণাবলী যখন কোনো গভীর ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন এবং আত্মার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি দূরীভূতকরণে সাধনারত কোনো সাধকের চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে সন্নিবেশিত হতে থাকে, তখন সে হয় আধ্যাত্মিক ও অধিবিদ্যক জগতের জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত। স্বজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি হয় তাঁর দূরদৃষ্টির হাতিয়ার। জামাল উদ্দীন আফগানীর মধ্যে এ ধরনের সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা, গভীর ধর্মীয় অনুভূতি এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর সমাবেশ ছিল বিধায় ইসলামের বিশ্বব্যাপী ও চিরন্তন আহ্বান

নিয়ে তিনি সব রকম ও শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছেন।[২০] কোনো ধর্মীয় সংস্কারকের মধ্যে যদি উপর্যুক্ত নৈতিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী না থাকে, তবে তাকে প্রকৃত মুজাদ্দিদ ও ইসলামের প্রতিনিধি বলা যায় না। জামালউদ্দীন আফগানীর মধ্যে অবশ্যই এসব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল; কারণ, তাঁর ঈমান ও আকিদা, তাঁর আমল ও আখলাক এবং এলেম ও লেনদেন সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদ, সমালোচনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার শোরগোল মুসলিম বিশ্বের কোথাও কচিৎ তেমন শোনা যায়নি। বরং ভারতবর্ষ ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, মিশর, হেজাজসহ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যেখানেই তিনি পৌঁছেছেন, সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়, উলামা-মাশায়েখ সম্প্রদায়, ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশেষত শিয়া ও সুন্নীহ্ উভয় মাযহাবের নেতৃস্থানীয় আলিমগণ ও ধর্মীয় এলিট নির্বিশেষে সবাই তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সব বৈশিষ্টই তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। স্বীয় জীবনে আমলকৃত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণের সর্বোচ্চ উৎকর্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নৈতিকতার দৃঢ়তা ও উৎকর্ষতা সাধনই মুসলমানদের ঐক্য, সংহতি ও সমৃদ্ধির দ্বিতীয় ধাপ।[২১]

সামষ্টিক নৈতিকতা: আফগানী শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ের নৈতিক সাধক হয়ে সবাইকে বসে থাকতে বলেননি, বরং তিনি সামষ্টিক কাজকেই অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। মুসলিম জাহান একটি অখন্ড ব্যক্তিত্বের ন্যায়; আর এর প্রতিটি বিষয়ই সামষ্টিকতা ও এজতেমায়ী আমল দ্বারা পরিপূর্ণ। আর এই সামষ্টিক জীবনে সবাই মিলে মিশে থাকার জন্য কতিপয় দলীয় ও সংঘবদ্ধ ধারণা ও নীতি মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, "মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল এবং তাঁর অনুসারীরা পরস্পরের প্রতি বড়ই সহনশীল ও সহানুভূতিশীল।"[২২] সেগুলোর মধ্যে কিছু আছে ইতিবাচক গুণাবলী যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শানিত করে, ব্যক্তিকে সুউচ্চ মহিমায় অধিষ্ঠিত করে তোলে; স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের নিকটই তাকে অতি দূর্লভ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। সেগুলো হলো– (ক) পরোপকার, (খ) ক্ষমা, (গ) দয়া, মায়া ও সহানুভূতি, (ঘ) দানশীলতা, (ঙ) উদারতা, (চ) ঔদার্য্যতা, (ছ) অন্যের দোষ-ত্রুটি না খোঁজা, (জ) নিজের পছন্দকে বলি দেয়া, (ঝ) নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট ও নীচু মনে করা, (ঞ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা। (ট) মানুষের ও সৃষ্টির প্রতি

অফুরন্ত ভালবাসা প্রদর্শন করা, অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বড় মনে করা, নিজের জন্য যা পছন্দ করা অন্যের জন্যও তা একইভাবে পছন্দ করা। উপর্যুক্ত গুণাবলীসহ যাবতীয় মানবীয় মহৎ গুণই ইসলামী নৈতিকতার অংশ। নৈতিক গুণাবলীর সারবস্তু হলো আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ। মুসলমান যদি শুধু ভোগী হয়, ত্যাগের মহিমায় নিজকে উৎসর্গ না করে; তবে জড়বাদী ও ভোগবাদী ধর্মহীন ব্যক্তির সাথে তার আর পার্থক্য থাকেনা। তাই আফগানীর শিক্ষা হলো দ্বীনের জন্য, মানুষের জন্য, বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজের জান, মাল, সময় ও সন্তুষ্টিকে কুরবানী করতে হবে। আর এহেন ত্যাগের দৃষ্টান্ত তিনি স্বীয় জিন্দেগীতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যও এটিকে অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় কাজ হিসেবে বিধিবদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা: ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর মুসলিম বিশ্ব যখন খিলাফাতবিহীন হয়ে পড়ে, তখন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব মুসলিম চিন্তাবিদ ইসলামী বিশ্বের হারানো খিলাফাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বা মুসলিম জাতির হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য চিন্তা, দর্শন, লেখনী এবং ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা জামাল উদ্দীন আফগানী অন্যতম। তাঁর মতবাদকে বলা হয় "প্যান-ইসলামিজম"। প্যান-ইসলামিজম (Pan Islamism) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্ব মুসলিমবাদ তথা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।[২৩] ইসলাম ধর্মের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাই মূলত প্যান-ইসলামিজম। অর্থাৎ "সব মুসলিম ভাই ভাই"–দেশ, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই"– এটিই হলো ইসলামী জাতীয়তাবাদ তথা আন্তর্জাতিকতাবাদের মূলকথা। মূলতঃ জামালউদ্দিন আফগানী যে প্যান-ইসলামিজমের কথা বলেছেন তার প্রকৃত উৎস আল্লাহ্‌র কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ্‌তেই বিদ্যমান আছে। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, "হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একজন পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার দেহ থেকেই তাঁর সঙ্গীনিকে বের করে তাদের উভয় থেকে অগণিত নারী-পুরুষকে সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।[২৪] বর্ণিত আছে, "হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার।"[২৫] উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের ভাষার উক্তির মাধ্যমে তিনিই যে মানুষের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক তা যেমন ঘোষণা করেছেন, তেমনিভাবে সব মানুষই যে একই পিতা-মাতা আদম থেকে সৃষ্টি সে ব্যাপারেও মানব জাতিকে নিশ্চিত করেছেন। এহেন

বক্তব্যের মধ্যেও এক ধরনের বিশ্ব জাতীয়তাবাদ বা প্যান-ইসলামিজম নিহিত আছে। বলা বাহুল্য যে, কুরআনের উপর্যুক্ত বক্তব্য মানব জাতির সব সদস্যকে উদ্দেশ্য করে বলা হলেও, এর ধারক ও বাহক হলো মুসলিম জাতি।

কাজেই, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর আহ্বান কুরআন থেকেই যে নিঃসৃত হয়েছে তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। রসূলে করিম (সঃ) বলেছেন, "হে ভ্রাতৃমন্ডলী! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের নিকট থেকে অন্ধকার যুগের সব রকম আভিজাত্য, গৌরব, বংশগত কৌলিন্য, অহংকার সব দূর করে দিয়েছেন। জেনো রেখো, তোমরা সব মানুষই এক আদমের সন্তান, আর সে আদম মাটির তৈরী।"[২৬] তিঁনি আরও বলেন, "আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে অধিক খোদাভীরু। আদম (আঃ) থেকে অদ্যাবধি সব মানুষই চিরুনীর দন্ডের ন্যায় সম্পূর্ণ সমান। কোনো আরবী কোনো আজমীর চেয়ে যেমন শ্রেষ্ঠতর নয়, তেমনি কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপরও কোনো শ্বেতাঙ্গের বা গৌরাঙ্গের কোনো আভিজাত্য নেই। যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য তা শুধু তাকওয়া বা খোদাভীতির কারণে।"[২৭] কুরআনে আরও বলা হয়েছে, "মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই।"[২৮] আরও বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মত বা জাতি একটি মাত্র জাতি এবং আমিই তোমাদের রব বা প্রতিপালক; অতএব, তোমরা কেবলমাত্র আমারই ঈবাদত কর।"[২৯] আরও বর্ণিত আছে যে, "মু'মিনরা ভাল কাজে ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করে আর পাপ ও সীমালংঘনের ক্ষেত্রে অন্যকে বাঁধা দেয় এবং আল্লাহ্কে ভয় করে।"[৩০] উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াত ও রসূলের (সঃ) বাণীরাজি থেকে একথা স্বতঃই প্রমাণিত ও প্রতীত হয় যে, ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো দেশ, কাল, ভাষা, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে অতিক্রম করে, শুধু ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী গড়ে তোলা। বিশ্বাসের কারণেই একজন ভারতীয়, ইরানীয়, আফ্রিকান, চৈনিক নির্বিশেষে সব মুসলিমই একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আল্লামা ইকবালের ভাষায়, "চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তান হামারা; মুসলিম হ্যায়ে হাম/ওয়াতনে সারে জাহাঁ হামারা" অর্থাৎ "চীন আমার, আরব আমার, ভারত আমার নহেগো পর/ মুসলিম আমি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে যে আমার ঘর।"[৩১] কাজেই প্রমাণিত হয় যে, প্যান ইসলামিজমের ধারণা ইসলামের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ।

প্যান-ইসলামিজম ইসলামের একটি দার্শনিক প্রত্যয়; কিন্তু, এর বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়েছে ইসলামী খিলাফাতের মধ্যে। আর এ খিলাফাত দু'ধরনের। (এক) সাধারণ খিলাফাত এবং (দুই) বিশেষ খিলাফাত। সাধারণ খিলাফাতের

পরিধি অনেক ব্যাপক ও গূঢ়। খিলাফাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। শব্দটি আরবী এবং এর প্রয়োগ রীতি ইসলামী শরিয়া আইন ও ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় খিলাফাত বলতে আল-কুরআনের বিধানানুযায়ী মানবীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করাকে বুঝায় যেখানে রাষ্ট্র বা শাসন কর্তৃপক্ষ থাকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সঃ) আইনগত কর্তৃত্বের অধীনে। এক্ষেত্রে প্রকৃত ইলাহ্ বা সার্বভৌমত্বের মালিক হলেন মহান আল্লাহ্। মানবীয় শাসক বা শাসন কর্তৃপক্ষ সেখানে সারা জাহানের প্রকৃত শাসক বা হুকুম দাতা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নিরঙ্কুশ শাসনের ও সার্বভৌমত্বের অধীনে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা পালন করেন মাত্র।[৩২] অন্যভাবে বলা যায় যে, খিলাফাত হলো এ জগতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর দেয়া এ বিশাল নিয়ামতরাজীর রক্ষণাবেক্ষণ করা, এ বিশ্বকে মহান আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করা এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক এবং অর্জিত সম্পদরাজী মানুষের মাঝে সমভাবে বন্টনের উদ্দেশ্যে রাষ্টব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করা। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বলা হযেছে, "আমি যমিনের বুকে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।"[৩৩] আল-কুরআনের উপর্যুক্ত বাণীতে যে খলিফার করা বলা হয়েছে–তা সাধারণ খিলাফাতের সমর্থন করে। এক্ষেত্রে এ দুনিয়ার সব মানুষই আল্লাহ্র খলিফা হিসেবে বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে, খিলাফাত কোনো মালিকানা বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ নয় বরং প্রকৃত মালিকের ডেপুটি বা ভাইসরয় হিসেবে দয়িত্ব পালন করা। এ বিশ্বজগতের নিরঙ্কুশ মালিক হলেন আল্লাহ্ আর মানব জাতি হলো তাঁর মনোনীত ও নির্বাচিত খলিফা বা প্রতিনিধি। এহেন প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সব মানুষই সমান; সেখানে মুমিন-ফাসিক, মুসলিম-অমুসলিম কোনো ভেদাভেদ নেই। জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, দেশ, ঐতিহ্য নির্বিশেষে সব মানুষই আল্লাহ্র খলিফা। সব মানুষই যে আল্লাহ্র খলিফা–এটি একটি অধিবিদ্যক ধারণা। এ ধারণাটি আল্লাহ্র জাত ও সিফাতের অংশ। এ ধারণা মতে, মানুষের যাবতীয় কাজই খিলাফাতের অংশ হিসেবে বিবেচিত। মানুষ হলো আল্লাহ্র আপন কুদরতের নিজস্ব সৃষ্টি। যেমনঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে, "আল্লাহ্ পাক আদমকে নিজ সূরতে সৃষ্টি করেছেন।" এখানে সূরত অর্থ আকৃতি নয় বরং প্রকৃতি। আর আল্লাহ্র প্রকৃতির কিছু অংশ বা সাদৃশ্য মানব সত্ত্বায় না থাকলে খলিফা হওয়া সম্ভব নয। মহা আল্লাহ্ অসংখ্য গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্যই মানুষের মধ্যে আছে। জীবন, দর্শন, শ্রবণ জ্ঞান, সৃষ্টি কুশলতা এসবই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান যা আল্লাহ্র অনন্ত গুণের অংশ।

আল্লাহ্ পাক যেমন মহা প্রকৌশলী ও অসীম শক্তির আধার, সব বিষয়ের পরিপূর্ণ ভান্ডার; তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষও তেমনিভাবে অফুরন্ত সম্ভবনাময় এক প্রাণবন্ত সত্ত্বা। নিত্য, অভিনব সৃষ্টিকর্মে ও প্রেরণায় সে উদ্দীপিত-অনুপ্রাণিত। জাগতিক, প্রাকৃতিক ও খনিজ প্রায় সব শক্তিকেই সে প্রতিনিয়ত নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে চলেছে।[৩৪] নব নব সৃষ্টি ও শিল্প, প্রযুক্তি ও কৌশল দ্বারা সে এ রহস্যাবৃত বিশ্বজগতকে যেন স্বীয় হাতের মুঠোয় পুরে সাধারণের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে সুপ্ত ও লুকায়িত এই অনন্ত সম্ভাবনা ও সৃষ্টি কুশলতা–তা মহান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্রই যোগ্য প্রতিনিধিত্বের চরম ও পরম নিদর্শনের এক জ্বলন্ত পরাকাষ্ঠা। এহেন খিলাফাতের ক্ষেত্রে সব মানুষই আল্লাহ্র প্রতিনিধি বা মানস দর্পণ স্বরূপ। আত্মশক্তির অফুরন্ত ও বিরতিহীন বিকাশ এবং মস্তিষ্কের নিরন্তর উৎকর্ষতা দ্বারা আজ মানুষ অসংখ্য অসম্ভবকে করেছে সম্ভব এবং অসম্ভবের দূর্গম পথের সে মহা অভিযাত্রা তার সদা চলমান; অবিরত চলার ছন্দ ও গতিতে তা দুর্নিবার। মানুষের সৃষ্টি সুখের উল্লাসের এ দুর্বার গতিবেগ মানব সভ্যতাকে যে কোন্ অবস্থানে উপনীত করবে– তা বর্তমান প্রজন্মের মানুষের কাছে এক অজ্ঞাত, কল্পনাতীত বিষয়। মানুষের মাঝে লুকায়িত এই শক্তিকেই ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ বলেন, "অনন্ত প্রাণ শক্তি বা প্রাণ প্রবাহ", অন্যদিকে মুসলিম দার্শনিক আল্লামা ইকবাল বলেছেন খূদী বা আত্মশক্তি। বলা বাহুল্য যে, মানুষের মধ্যকার এই যে অমিত বিক্রম, শক্তি ও অবিরাম সৃষ্টিশীলতা, এই হলো বিশ্ববিধাতার সাধারণ খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্বের এক নিগূঢ় তাৎপর্য। খিলাফাতের তথা প্যান ইসলামিজমের আলোচনার প্রক্ষাপটে খিলাফতের তাৎপর্যের ক্ষেত্রে আমরা উপর্যূক্ত দু'প্রকারের মধ্যে সাধারণ খিলাফাতের তাৎপর্যসমূহ এখানে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের খিলাফাত যা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের নামান্তর–সেটি সম্পর্কে এখন আলোকপাত করা হবে। জামাল উদ্দীন আফগানী যে ধরনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন তা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর খিলাফাতের অংশ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং সৎ কার্যাদি সম্পন্ন করবে আল্লাহ্তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে এ পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব বা খিলাফাত প্রদান করবেন পূর্বসূরীদের অনুরূপ।"[৩৫] আল-কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, খিলাফাত অর্থ শাসন কর্তৃত্ব যা ঈমান ও নেক আমলের সাথে সম্পর্কিত। এ দৃষ্টিতে শুধুমাত্র যারা আল্লাহ্র অনুগত, মুখলেস ও

মুহ্সিন বান্দাহ্, তাঁরাই খিলাফাত লাভের যোগ্য। অন্য কথায়, যারা আল্লাহ্র বিধানানুযায়ী ন্যায়সংগতভাবে সরকার গঠন করে এবং আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করেন, তাঁর নির্দেশিত পন্থায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে পরিচালনা করেন, তাঁরাই খলিফা। অর্থাৎ রসূল (সঃ) ও তাঁর পরবর্তী খলিফা চতুষ্টয় এবং, তাঁদের পদাঙ্কানুসারী নেককার, ঈমানদার, সৎ ও খোদাভীরু শাসকবর্গই প্রকৃত প্রস্তাবে এ পর্যায়ের খলিফা হওয়া যোগ্য হিসেবে বিবেচিত। জামাল উদ্দীন আফগানী মূলতঃ এ ধরনের ঈমানদার ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত খিলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর প্যান-ইসলামিজম মতবাদটি চালু করেন। তাঁর এ খিলাফাত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাটিও যতটুকু না তাত্ত্বিক ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক। এ ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবগুলো অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে সফর করে জনমত সংগঠিত করেন। মূলতঃ তাঁর উক্ত প্রচেষ্টার ফলেই ইসলামী বিশ্ব পরবর্তীতে পুনরায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে যা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, মিশরসহ মুসলিম বিশ্বের অনেক ভূখন্ডেই সুশৃংখল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় করে, সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে জামাল উদ্দীন আফগানীর উক্ত তত্ত্ব বাস্তবায়নের একটি প্রয়াস ইদানিং বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে আমাদের নিকট প্রতিয়মান হয়।

এখানে জামালউদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকেরই সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর চিন্তার উপর্যুক্ত তিনটি দিকের প্রতিটির উপরই স্বতন্ত্রভাবে প্রচুর গবেষণার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার কাজ আমাদের হাতে অপেক্ষিত আছে।

তথ্যনির্দেশ

১. M. M. Sharif, *A History of Muslim Philosophy*, ed., vol II, rep (Delhi: Low Price Publications, 1995), P. 1463.

২. *ঐ*, পৃ. ১৪৬৪।

৩. আমিনুল ইসলাম, "আল আফগানী," সম্পা, ফাহমিদ-উর-রহমান, *জামাল উদ্দীন আফপানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ*, (ঢাকা: দি পাইওনিয়ার ,২০০৩ ইং), পৃ. ১১৮।

৪. *পূর্বোক্ত*।

৫. *The World Book Dictionary*, Vol. 2, P. 2881.

৬. *পূর্বোক্ত*।

৭. *ঐ*।

৮. *ঐ*।

৯. *ঐ*।

১০. George H. Sabine, *A History of Political Theory*, 4th ed., rev. by Thomas L. Thorson, (New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 1973), PP. 172-73.

১১. আমিনুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*।

১২. *পূর্বোক্ত*।

১৩. *পূর্বোক্ত*।

১৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ৯ম খন্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৯ ইং), পৃ. ৯৯-১০০।

১৫. *আল-কুরআন*, ৬১:০২।

১৬. আলবার্ট হুরানী, "জামাল আল-দীন আল-আফগানী", অনু. আব্দুস সবুর, সম্পা. ফাহমিদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭।

১৭. আবদুল গফুর, "মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও মুক্তির দিশারী সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী", সম্পা. ফাহামিদুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৮. *আল-গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'আদাত*, ১ম খন্ড, অনূ. নূরুর রহমান, ষষ্ঠ মুদ্রণ, (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬ ইং), পৃ. ৩৪।

১৯. *পূর্বোক্ত*।

২০. কে, এম. মোহসীন, "সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী", সম্পা. ফাহামিদুর রহমান, পৃ. ১১১।

২১. আমিনুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৯।

২২. *আল-কুরআন, ৪৮: ২৯।*

২৩. Mohammad Shah, *Pan-Islamism in India & Bangladesh*, (Karachi: Rayal Book Company, 2002), pp. 4-5.

২৪. *আল-কুরআন*, ৪:১।

২৫. *ঐ*, ৩৪:১৩।

২৬. আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫ ইং), পৃ. ২৪৩।

২৭. *ঐ*, পৃ. ২৪৪।

২৮. *আল-কুরআন*, ৪৯:১০।

২৯. *ঐ*, ২১:৯২।

৩০. *ঐ*, ৫:২।

৩১. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *আল্লামা ইকবাল*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬ ইং), পৃ. ৮৬।

৩২. মোঃ তৌহিদুল হাসান, "বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, (আই.বি.এস., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ ইং), পৃ. ২৯।

৩৩. *আল-কুরআন*, ২:৩০।

৩৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

৩৫. *আল-কুরআন*, ২৪:৫৫।